সন্তাপ

জামিল হাসান সুজন

সামনের রাস্তাটা, রাস্তার পাশের দোকানপাট, খোলা মাঠ আর মাঠের ওপাশে বিশাল আকাশ আমার খুব চেনা। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রীল ঘেরা বারান্দায় বসে থেকে এসবই দেখি। স্থির নীল রং আকাশটার। সাদা সাদা মেঘগুলো কখনও কখনও ভেসে ভেসে চলে যায়। খুব ভোরবেলা আর সন্ধ্যায় আকাশের রং ধুসর থেকে অস্পষ্ট। এগুলো আমার খুব চেনা। দোকান গুলোতে ফুল ভল্যুমে হিন্দী গান বাজে। বেলা বাড়তে থাকে। গনগনে উত্তাপে পিচ গলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন নেশার মত আমেজ আসে।

আজ সকাল থেকেই শুনতে পাচ্ছি এক টানা সানাইয়ের সুর। কাছে পিঠে কোথাও সম্ভবত বিয়ে হচ্ছে। এইতো কয়েক মাস আগেই মিমির বড় বোনের বিয়ে হল। মিমি নামটা মনে হতেই বুকের মাঝে শিহরণ জাগে। মিমিকে যখন দেখি তখন মনে হয় কোন্ সুদূর থেকে ভেসে আসছে সুমধুর সংগীতের সুর।

কী উৎসব মুখর ছিল মিমিদের বাড়িটা! ওদের বাসার সাথে আমাদের খুব সুন্দর সম্পর্ক। আমি একলা দাঁড়িয়ে ছিলাম এক কোণায়। মিমিকে সেদিন লাগছিল চপলা, চঞ্চলা এক পরীর মত। কী ছুটাছুটি আর ব্যস্ততার ভান! চশমা পরা হ্যাংলামত একটা ছেলে কি যেন কথা বলছিল হাত নেড়ে নেড়ে। মিমি আর ওর বান্ধবীরা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

লোকজন চেঁচামেচি কলরব এসব কোন কিছুই আমাকে টানছিল না। আমার চোখ দুটো নিবদ্ধ ছিল মিমির উপর। ও কোথায় কি করছে - ওর সব কিছুই আমার ভাল লাগে।

আমাকে দেখতে পেয়ে আমার পরিচিত বন্ধুরা হৈ চৈ শুরু করে দিল - আরে রাজন কি করছিস এখানে? গুরুজনরা চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল। তাদের দৃষ্টিতে আমি মোটেই ভাল ছেলে নই। জুনিয়র ছেলেরা সম্মান দেখাচ্ছিল- রাজন ভাই, সালাম।

মিমি ঘুরতে ঘুরতে আমার সামনে এসে পড়লো। আমি ডাকলাম, 'মিমি- ।' ও আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল। আমি আবারও ডাকলাম, 'মিমি শোন, তোমাকে না আজ খুব- - - !' কথা জড়িয়ে গেল আমার। এই একটি মাত্র মানুষ যার কাছে গেলে ভাষা হারিয়ে ফেলি আমি।
মিমি কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলো। তারপর বলল,' আজ বড় আপার বিয়ে, এদিনে আপনাকে অপমান করতে চাইনা, তাছাড়া আপনি জলি আপার ভাই। কলেজেও আপনি আমাকে ফলো করেন। খবরদার, আমি পছন্দ করিনা।' কথাটি বলেই মিমি অহংকারী পদক্ষেপে চলে যায়।
বান্ধবীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা- 'এই মিমি, তোর সাহস তো কম না। জানিস কেমন গুন্ডা ঐ রাজন।' মিমি ভ্রুকুটি করে বলে- 'আরে রাখ্ - আমি ওইসব গুন্ডা পান্ডা ভয় পাই না।'

সেই মিমির সাথে আবারও দেখা হল বড় রাস্তার মোড়ে। হোন্ডা চালিয়ে সোজা চলে আসছি। মিমি বোধ হয় একটা রিক্সা খুঁজছিল। একদম ওর সামনে গিয়ে ব্রেক কষি। ও চমকে তাকালো। 'কেমন আছো মিমি?' মিমি উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ' তাতে আপনার কি?' বলেই হন্ হন্ করে চলে গেল। অন্য কোন মেয়ে হলে এত স্পর্ধা পেত না। কিন্তু মিমির সাথে আর দশটা মেয়ের তুলনা চলেনা। ওর রাগী চেহারা আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলো শুনেও মনটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

আমি থাকি আমার আপার বাড়ি। কোথায় কি করি সেদিকে আগ্রহ নেই আপা দুলাভাইয়ের। দুলাভাইয়ের হোন্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অবাধ স্বাধীনতা আমার। আগে আব্বা-আম্মার ওখানে আমরা একসাথে থাকতাম। কি একটা কারণে খিটিমিটি বেধে গেল। আপারা অন্য বাসা নিল আর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাকেও সঙ্গে নিল। আব্বা-আম্মা কিছু বললেন না। ছোটবেলা থেকেই দেখছি কারোর ব্যাপারে কারও আগ্রহ নেই। লেখাপড়ার পাট চুকেছে অনেক আগে। তার বদলে জুটেছে বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, সিগারেট, মদ ইত্যাদি। আব্বা আরেকটা বিয়ে করার পর শুনেছি আম্মাও নাকি মামার বাড়ি চলে গেছে। ছোট ভাইটার উপর মায়া হতো। শুনতে পাই সে নাকি এখন আমারই মত- - -।

মিমিকে দেখার জন্য ওদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এ সময়টা ও কলেজে যায়। বাসা থেকে বের হতেই কাছে এগিয়ে যায় - ' মিমি, চল তোমাকে একটা লিফ্ট দিই।' মিমি রাগে ফুঁসে উঠলো-' আপনার সাহস তো কম না, পায়ের স্যান্ডেল গুলো দেখেছেন, দরকার হলে ওগুলোর সদ্ব্যবহার করবো।'

তারপর আর মিমির মুখোমুখি হইনি; ইচ্ছায় না অনিচ্ছায় না। এর পরেই ঘটলো দুর্ঘটনাটা। ফুল স্পীডে ছুটছে আমার হোন্ডা। মিউজিয়মের মোড়ে টার্নিং-এ একেবারে সামনে পড়ে গেলাম একটা ট্রাকের। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আমি হাসপাতালের বেডে। আমাকে ঘিরে আছে অসংখ্য পরিচিত মুখ। মাথায় ব্যান্ডেজ, পায়ে ব্যান্ডেজ, সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা।

এক মাস পর হাসপাতাল থেকে ফিরছি। আমার বগলে ক্রাচ। ডাক্তার বহু চেষ্টা করেও আমার পা দুটো সারাতে পারেনি। বাম পা হাঁটুর নীচ থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। আমি এখন পঙ্গু।

অতঃপর আমার স্থান আপার বাড়ির এই গ্রীল ঘেরা বারান্দায়। একটা বেতের চেয়ারে সারাটা দিন বসে থাকি। অনুভূতিগুলো কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। দুঃখ হয়না, কষ্ট হয়না, শুধু মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা স্ফীত হয়ে উঠে। অজানা কারও উপর রাগে গা জ্বলতে থাকে। মনে হয় সামনের গ্রীল গুলো দুমরে মুচরে ভেঙ্গে চুরমার করে দিই।

পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই একবার করে এলো। সান্তনার কথা শোনালো। আপা রেগে যেতেন সকলের উপর। বলতেন, 'কারও আসার দরকার নেই।' মাঝে

মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন।

সামনের দৃশ্যগুলো এখন আমার অতি পরিচিত, অতি আপন। অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি এ হয়তো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কত যে স্মৃতি মনে এসে ভিড় করে। একবার এক রিক্‌শাওয়ালাকে ভীষণ প্রহার করেছিলাম। একবার এক ভদ্রলোকের টাই খুলে ফেলেছিলাম। হাজতে গেছি কয়েকবার। একবার ড্যাগারের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলাম কয়েক দিন। কি রকম দিন গেছে সে সব!

বন্ধু-বান্ধবরা কিছুদিন নিয়মিত আসতো। এখন আর আসেনা। তবে কালু নামের ছেলেটা রোজ আসে। পাশে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। সিগারেট টানে আর শহরের কোথায় কি ঘটলো জানায়। সময়টা বেশ কাটে। কালু বলে,'ওস্তাদ আমি রেগুলার আসবো।' কথা রেখেছে কালু। প্রতিদিনই ও আসে।

একদিন মিমি আর ওর আম্মা এল। আমি বারান্দায় বসে আছি যথারীতি। মিমির আম্মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দু'একটা কথা বললেন, তারপর ভিতরে চলে গেলেন। কিন্তু মিমি গেলনা, গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো বেশ কিছু সময়। সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো উদাস দৃষ্টিতে।

কয়েকদিন পর মিমি আবার এল। এবারে একা। আমি সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আছি। মিমি আস্তে করে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে এসে বসলো। মিমিকে দেখলে কেন যেন আগেকার মত আমার হৃদয় আর নাচেনা। যে মিমিকে কাছে পাবার জন্য, যার সঙ্গে কথা বলার জন্য কতই না চেষ্টা করেছি। আজ সে এইতো আমার কয়েক হাত দূরে বসে আছে। ইচ্ছে করলেই কথা বলা যায় , ওর মাথার চুল স্পর্শ করা যায়। মিমি বসে আছে নিঃশব্দে। সেদিনকার মতই উদাস আর বিষণ্ন। আমি সহসা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চাইলাম। অবাক হয়ে দেখলাম দু হাতে মুখ ঢেকে আছে মিমি। ও কি কাঁদছে?

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ৩০/০৪/২০০৬